Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 505 – 512
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে প্রাথমিক শিক্ষা : বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ও মদনমোহনের শিশুশিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা

ড. সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি, আসাম
Email ID : brjsanjay24x7@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Nineteenth century, Western education, School book society, primary education, middle class, Barnaparichay, Sishusiksha.

Abstract
In the 19th century, the modern European education system began in Bengal. After the British took control of Bangadesh after the Battle of Palashi, some missionaries started spreading Western religious education on their own initiative in some places. After that, Fort William College was established and the institutionalization of Western education system began. Later establishment of Hindu College, establishment of School Book Society etc. played an active role in expanding western education system in this country.

Since the establishment of School Book Society, Western style of primary education started in this country. The Calcutta Book Society was established in 1817 AD, many Bengali books were printed from here. History says that on the one hand, with the rise of the capitalist system, the feudal system fell and the hereditary occupations were replaced by middle-class communities. In such a situation, childhood was prolonged and due to the spread of western education, many people got the opportunity to receive education. With that, the attempt to write textbooks suitable for primary education began. In the early stages, several books were published on the introduction of alphabets and letters, but they all did not properly or scientifically organize Bengali letters or alphabets. So later, the famous Pandit Madanmohan Tarkalankar and Ishwarchandra Vidyasagar joined hands in writing elementary textbooks. In this research paper we will try to present a comparative studyof 'Barnaparichay' written by Iswarchandra Vidyasagar and 'Sishusiksha' written by Madanamohan Tarkalankar and also try to realize that the situation of early primary education system of modern Bengal.

Discussion

ভারতবর্ষে উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজদের সহায়তা এবং দেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুয়াত হয়। তাই দেখি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বুক সোসাইটি স্থাপন হবার পর প্রথমদিকে এখান থেকে অনেকগুলো বাংলা বই মুদ্রিত হয়েছিল। সমালোচক বলেন যে, একদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হলো আর বংশানুক্রমিক পেশার বদলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। এমন অবস্থায় শৈশব প্রলম্বিত হল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে অনেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করল।[১]

শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'লিপিধারা' ও 'বাংলা লিপি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮১৬ ও ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। এই শিশুপাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করার লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে শেষোক্তটির লেখক ছিলেন কেপ্টেন স্টুয়ার্ট ও জে পিয়ারসন। এখানে ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা, গণিত, ব্যাকরণ পাঠে বিশুদ্ধ বানান ও যথাযথ অক্ষর বিন্যাসের ওপর দেওয়া হত জোর। মদনমোহন রচনাবলীর সম্পাদক বলেন —

> "দেশীয় ব্যক্তিদেরও প্রচেষ্টায় পাঠ্য বই প্রকাশিত হ'ল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একটি বর্ণ পরিচয় গ্রন্থে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগ ছিল। আর রাধাকান্ত দেব রচিত 'বাংলা শিক্ষা গ্রন্থ' ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।"[২]

১৮৪০ এ স্থাপিত হিন্দু পাঠশালায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রচিত 'শিশুসেবধি' বর্ণমালা পড়ানো হতো এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সম্ভবত এই পুস্তকগুলি তখনকার হিসেবে যথেষ্ট ছিল না। তাই মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পন্ডিত ব্যক্তিকে প্রাইমার রচনায় হাত দিতে দেখা যায়। ১৮৪৯ এ মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তৃতীয় ভাগ বেরোয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। আর বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বেরোয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। 'শিশুশিক্ষা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

'বর্ণপরিচয়' এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়' বেশ কিছুদিন একসঙ্গে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগদান করার পরে এই বইটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শ সমগ্র বাংলায় অনুসরণ হতে শুরু করল। এই শিক্ষানীতি নির্মাণ করা হয়েছিল মূলত শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি ও ভাববোধের উপর নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ এর প্রকাশ। তাই 'বর্ণপরিচয়'কে আধুনিক শিশুশিক্ষা নীতির প্রথম ধাপের গ্রন্থ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ গ্রন্থে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সাহায্যে শব্দ ও বানান শিক্ষা দিয়েছেন। পরে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্য গঠন করেছেন। যে বাক্যগুলি খুবই পরিচিত, প্রচলিত; সেগুলোর সহায়তায় তিনি বাক্য গঠন পদ্ধতি শেখাবার প্রয়াস করেছেন। বিশেষ করে ছোট বয়সের বালকদের মধ্যে বিদ্যালয় সংক্রান্ত যে বাক্যগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে।

উনিশ শতকে প্রাথমিক বর্ণসমূহের পরিচয় গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা না হলেও তিনি বর্ণপরিচয়ের সংস্কার ও পরিশীলিত রূপ হিসেবে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নামে এমন গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, যাতে তাঁর ভাষা শিক্ষা দেওয়ার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সমাজ জীবনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে কখনো অতিরিক্ত কিছু পছন্দ করতেন না। তাই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে পূর্বে ব্যবহৃত বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ করে যেগুলি বাংলায় অব্যবহৃত এবং অতিরিক্ত বলে মনে করেছিলেন, সেগুলো সংস্কার করে দিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ বিদ্যাসাগর স্বর-ব্যঞ্জন হিসেবে বাংলা বর্ণমালাকে সাজাতে গিয়ে পূর্ব প্রচলিত ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনের মধ্যে দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ৯-কার বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বলে এদের বাদ দিয়েছিলেন।"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 505-512
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুস্বর, বিসর্গকেও তিনি স্বরবর্ণ মালা থেকে বহির্ভূত করে ব্যঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চন্দ্রবিন্দু- কে স্বতন্ত্র অক্ষরের মর্যাদা দেন। বিদ্যাসাগর যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ষ' - কে ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ এটি যুক্ত ব্যঞ্জন।

ড, ঢ ও য, - এই তিনটি ব্যঞ্জন পদের শেষে থাকলে যথাক্রমে 'ড়', 'ঢ়', ও 'য়' হয়। বিদ্যাসাগর এই বর্ণগুলির উচ্চারণ পার্থক্য ও গঠন পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র হরফ হিসাবে সংযোজন করেছেন।

'বর্ণপরিচয়ে' ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে শিশুদের বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করানোর একটা আভাস বিদ্যাসাগর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শুরু থেকেই। প্রথম থেকে অষ্টম পাঠ অব্দি এই প্রক্রিয়া চলেছে। নিরাভরণ বর্ণপরিচয়ের পর যখন বর্ণ সংযোজন করে বর্ণযুক্ত শব্দ শিশুরা শিখতো, তখন তাদের মন নিশ্চয়ই খুশিতে নেচে উঠতো, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না-

"বড় গাছ। ভালো জল। পথ ছাড়। মেঘ ডাকে। খেলা করে।"[৪]

বাক্যগুলি যে তাদের মনে পুলকের ঝড় তুলতো, সে কথা অনুমান করা যায়। শিশু রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাল্যজীবনে 'বর্ণপরিচয়ে'-র প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, যেদিন তিনি এই বর্ণপরিচয়ের বানানের ঝঞ্ঝা পার হয়ে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়লেন সেদিন সেই পংক্তি তার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা হয়ে দেখা দিল।[৫]

পাশাপাশি মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' যখন রচনা করেন তখন বাংলায় শিশুদের পাঠ্যপুস্তক ছিল খুব কম। তাছাড়া সবগুলিতেই যে শিশুদের বর্ণপরিচয় পাঠ থাকত, এমন নয়। 'শিশুশিক্ষা'য় মদনমোহন প্রথমে এদিকে নজর দিলেন। প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় শেখানোর পাশাপাশি তিনি শিক্ষকদের জন্য নির্দেশ দেন কিভাবে কাঠের ধারা অনুসারে বর্ণ পরিচয় করাতে হবে। শুধু স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে নয়, ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও একই ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বর ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ শিক্ষকের মতো মদনমোহন শিশুদের অক্ষর তৈরি করতে শেখাচ্ছেন। যেমন- "জর জর', 'দর দর' ইত্যাদি।[৬] এই কৌশল এতটাই সূক্ষ্ম, যে একই সঙ্গে শিশু পরিচিত হবে পরবর্তীকালে পাঠ্য ধ্বনাত্মক শব্দের সঙ্গেও। পঞ্চম পাঠেই শিশু জানতে পারে যে 'ঘর' করতে হয়, 'ফল' ধরতে হয়। পরের পাঠে তিনি শিশুকে নিয়ে ঢুকে পড়ে ছন্দের দুনিয়ায়। অবশ্যই আ-কার ই-কার ব্যবহার ছাড়া। 'ঝড় বয় / বড় ভয়' বা 'বড় ঘর / গড় নর।'[৭] ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তমিলের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে। 'শিশুশিক্ষা'র অষ্টম পাঠ থেকে চতুর্দশ পাঠ পর্যন্ত বাক্যগঠন শেখান মদনমোহন। এখানে শিশু জানে- কাক কালো হয়, ধান পাকে, পান এক রকমের খাদ্য, গান গাইতে হয় ইত্যাদি। ১৫-১৬ পাঠে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রয়েছে শিশুকে তার চারপাশ সম্পর্কে কিছু জানিয়ে রাখার প্রয়াস। 'রামনাথ' লোকের নাম, 'বালী' স্থানের নাম, 'শিশুশিক্ষা' বইয়ের নাম ইত্যাদি।[৮] অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের সাধারণ জ্ঞান দেবার এই পদ্ধতি মদনমোহনের কুশলী মনের পরিচয় দেয়।

বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়ে' অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রথম পাঠ থেকেই বর্ণ সংযোগ ও সংগতি আনবার চেষ্টা করলেন। যথা- 'বড় গাছ। ভালো জল। লাল ফুল। ছোট[৯] প্রভৃতি থেকে অষ্টম পাঠের – 'কাক ডাকিতেছে', 'পাখি উড়তেছে' 'পাতা নড়িতেছে'[১০] ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিনয়ভূষণ রায় বলেছেন—

> "আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুরা টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বাক্যের মতো ছোট ছোট বাক্য দিয়ে কথা বলে। কারণ তাদের পক্ষে বড়-বড় বাক্য দিয়ে কথা বলা ও মনে রাখা সম্ভব নয়। ঐ সব ছেলেদের কথা মনে রেখেই তিনি বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ১ নং পাঠে — 'বড় গাছ। ভাল জল। হাত ধর। বাড়ী যাও' — ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন।"[১১]

প্রথম দিকে শুধু শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরে এক শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোগে অর্থপ্রকাশের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। দ্বাদশ পাঠ থেকে বর্ণের সংযোগে পরস্পর অর্থবিশিষ্ট অনুচ্ছেদ রচনার দিকে তিনি ঝোঁক দিলেন। যেমন চতুর্দশ পাঠে লিখেছেন,

"আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি।"[১২] ইত্যাদি।

স্বীকার্য যে এই পাঠের সমস্ত কিছুই লেখাপড়া সংক্রান্ত। এর মধ্যে কয়েকটি পাঠে অমনোযোগী দুষ্ট প্রকৃতির বালকের কথা আছে (ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ)। ঊনবিংশ ও বিংশ পাঠে গোপাল ও রাখালের কথা আছে।[১৩] সুশীল গোপাল সবসময় আন্তরিক, পড়াশোনায় যত্নবান, সকলের সঙ্গে তার ব্যবহার চমৎকার। গোপালকে যে দেখে সেই ভালোবাসে। কিন্তু বিংশ পাঠের রাখাল একেবারে গোপালের ঠিক বিপরীত। পাঠে অমনোযোগী, দুষ্টু ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। তাই রাখালকে কেউ ভালোবাসে না। বিদ্যাসাগর বালকদের উপদেশ দিয়েছেন যে সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত, রাখালের মত নয়। এখানে নীতি শিক্ষা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে ভবিষ্যতের বাঙালি সমাজ গড়তে এই সামান্য উপদেশটুকুর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'য় উপদেশের ছলে কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ধারণা দেবার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। মদনমোহন নিজে শিক্ষক হওয়ায় তাঁর মধ্যে স্বভাব সুলভ গুরুমশাইয়ের মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। সেই গুরুমশাই-ই তাঁকে দিয়ে সম্ভবত উপদেশ বাক্য লিখিয়ে নিয়েছে। তাই 'গুরুমহাশয় দেখিলে রাগ করিবেন', কিংবা 'গুরুমহাশয় ভালোবাসিবেন না' - এই জাতীয় বাক্যগুলো সেই উপদেশাত্মক মনোভাবের দিকেই নির্দেশ করে। কুড়ি পরিচ্ছদে পিতা-মাতা ও গুরুর উপদেশ - এর গুরুত্ব, একুশে বর্ষাকালের ও মেঘের সম্পর্কে ধারণা, ইত্যাদি পরিচ্ছেদ পেরিয়ে ২৭ নম্বর পরিচ্ছেদে পাই সেই বিখ্যাত ছড়া। এখানে আছে -

"লেখাপড়া করে যে
গাড়িঘোড়া চড়ে সে।"[১৪]

লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার অভিনব পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করেছেন মদনমোহন। শিশুর পাঠের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন তাদের প্রিয় গাড়ি এবং ঘোড়াকে অবলম্বন করে। পরবর্তী ছড়াটির শেষ দুটি লাইনের উপদেশাত্মক ভাব ছেড়ে দিলে বাঙালি শিশুদের জন্য সেটি যে একটি অনবদ্য কবিতা সে কথায় কোনও সংশয় থাকে না। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা কাব্য কবিতায় পয়ারের জয়জয়াকার। পয়ারের এই ছন্দমিলকে একেবারে শিশুদের উপযোগী করে তাদেরই ভাষায় সেটিকে হৃদয়ের নিভৃত কোণে পাকাপাকি আসন পেতে দিলেন মদনমোহন। এবং এরই হাত ধরে যেন একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ পা বাড়াল শিশুসাহিত্যের প্রথম সোপানে। এইখানে পাঠক একটি লাইন খেয়াল করবেন— 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'[১৫] লিখেছেন মদনমোহন; বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সহজপাঠ' ১ম ভাগে লিখলেন —

"কচুপাতা থেকে টুপ টুপ করে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়।"[১৬]

তবে কী মদনমোহনের এই পংক্তি রবীন্দ্রনাথের মনে কোনও ছাপ রেখেছিল?

'শিশুশিক্ষা ১ম ভাগে' ২৮ টি অধ্যায় রয়েছে। খুব যত্ন সহকারে নির্মিত শিশুদের এই প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক যে এখনও পর্যন্ত অন্যতম সেরা এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' এর নাম করা যেতে পারে। আমরা উল্লেখ করেছি যে শিশুশিক্ষার বহু জায়গায় উপদেশাত্মক বাক্য রয়েছে। এই উপদেশ হয়তো শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দিতে পারে। শিশুদের ওপর গণ্ডী টেনে দিতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্তমান যুগে গ্রন্থটিকে অনেকটা কৃত্রিমও মনে হতে পারে। কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মদনমোহন যখন এই গ্রন্থটি লিখেছেন তখন ইংরেজ শাসনের জাঁতাকল এদেশের বুকে জোর চেপে আছে। দেশ শাসন করছে একটি ব্যবসায়িক কোম্পানি। এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কর্মচার তৈরি করা। ফলে একেবারে কোজো বাংলা যাকে বলে, তার বাইরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল অন্তত পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে। এবং এক্ষেত্রে যুগরুচির ব্যাপারও সম্ভবত থেকে থাকবে। ততদিনে বাঙালি সমাজে মধ্যশ্রেণি অর্থাৎ মধ্যবিত্তের উন্মেষ ঘটেছে। মধ্যবিত্ত কেরাণি শ্রেণির রুচিবোধও ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে সমাজের নানা বিভাগে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম

হয়নি। ফলে সেক্ষেত্রেও শিশুপাঠ্যের দুনিয়ায় 'বহুস্বরিক' বাচন শোনা প্রায় সম্ভব ছিল না। শাশ্বত ভট্টাচার্যকে উদ্ধৃত করে আমরা বলতেই পারি—

> "আমাদের সমাজের অধিকাংশ ছেঁটে দিয়েই উন্নতির ধাপগুলো পরপর ছকে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালি মধ্যশ্রেণি ভদ্দরলোকের বিকাশের ইতিবৃত্তই। ঔপনিবেশিক ভারতে যার উদ্ভব আর বিকাশের মূল ছাঁচটি তৈরি হয়েছিল। ...নিষ্ক্রিয় বিপ্লবে, আখের গুছানোয় আর আপোষে, এই মধ্যশ্রেণি ভদ্দরলোক মতাদর্শই থাকবন্দি সমাজে তার আধিপত্য কায়েম করেছে। এবং শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্গ, বর্ণ ইত্যাদি ভেদ-চিহ্ন বিষয়ে তার সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যাকে বলে গেড়ে বসেছে। এমতাবস্থায় শিশুসাহিত্যেও এই মতাদর্শ মাফিকই গড়ে ওঠে 'আত্ম'র এক বিশেষ পরিচয়, যে পরিচয়ে বাদ পড়ে যায় শিশুর আশপাশের বেশিরভাগ মানুষজনই। তারা থাকে ঐ 'আত্ম'র নির্মিত 'পর' হিসেবে, বিবিধ আখ্যানে "বিষয়ী"র স্থান থেকে নির্বাসিত, অতএব নিঃস্বর। বেশিরভাগ ছোটদের জন্য লেখাই সমতল বাচনে বহু স্বর হয়ে উঠতে পারে না।"[১৭]

'শিশুশিক্ষা'- র আর একটি দিক থেকেও গুরুত্ব রয়েছে। সেটি হচ্ছে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন বিষয়ক। আমরা জানি যে, মদনমোহন তাঁর দুই মেয়েকে বেথুনের নারীশিক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এটা হয়তো সবাই খেয়াল করি না যে 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থটি তিনি বেথুন সাহেবকে উৎসর্গও করেছেন। এই ভূমিকাটিতে লেখক জানাচ্ছেন যে, শিশুশিক্ষা গ্রন্থনাম "বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে"[১৮] প্রণীত হয়েছিল। সম্ভবত এইজন্যই 'শিশুশিক্ষা-২' -এর সংযুক্ত বর্ণশিক্ষার একেবারে শেষ যুক্তাক্ষর 'স্ত্র' এর বাক্য নির্মাণে মদনমোহন লিখেছিলেন—

> "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক।"[১৯]

দৃষ্টান্তটি একেবারে শেষে বসিয়ে গ্রন্থকার কী কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছেন! ১৮৫০-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থের সময়কাল এবং স্ত্রীশিক্ষা বিতর্ককে সামনে রেখে এই বাক্যটিকে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হতেই পারে যে যুক্তাক্ষর শিক্ষণের একেবারে শেষে এমন বাক্যমালার উদাহরণ কিন্তু অন্য এক বার্তা বহন করে। লেখক যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ— এই বাক্য যেন তারই জানান দেয়।

'শিশুশিক্ষা-৩' - এর ১৮৫০-এ প্রকাশিত ১ম সংস্করণের 'ঋজুপাঠ-4' এর বিষয়বস্তু তো তৎকালীন সময়ে বৈপ্লবিক বলা যায়। পরবর্তীকালে বহুচর্চিত 'সুশীল বালক সকলকে সমান ভাল বাসে'র স্থানে তার আদিপাঠরূপে আমরা পাই 'সুশীল বালক বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে।'[২০] এবং শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে পাঠ-অন্তর্গত যে রাম ও শ্যামকে পাওয়া যায় (১৮৬০-এর ১৫তম সং পরবর্তী) তার বদলে সেখানে পাই সামা ও বামা'-কে। একটু উদ্ধৃত করি—

> "রাখাল। তুমি ঘোষালদের সামা বামাকে দেখিয়াছ? আমি তাহাদের গুণের কথা শুনিয়া দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। আহা। তাহাদের যেমন রূপ, তেমনি গুণ। দুটি বইনে কেমন ভাব। কেহ কাহাকে উচ্চকথাটী কয় না। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দুজন একত্রে শয়ন করে, একসঙ্গে খেলা করে। কেহ কাহারো কাছ ছাড়া হয় না।"[২১] ইত্যাদি।

১৮৬০-এর পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে সামা ও বামার স্থানে চলে এসেছে রাম ও শ্যাম। ১৮৫৮-এর ৯ মার্চ মদনমোহনের মৃত্যু হয়। অনুমান হয় যে, নিজের জীবদ্দশায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য লিখিত এই পাঠে তিনি পরিবর্তন করেন নি সম্ভবত।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র নিজের মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে বা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক লিখে অথবা শিশুপাঠ্য প্রাইমার লিখেই ক্ষান্ত হননি মদনমোহন। তদুপরি সেই শিশুপাঠ্যে যাতে বালকের পাশাপাশি বালিকারাও সমান অধিকার পায়, তারও সচেতন আয়োজনে কোনো ত্রুটি তিনি রাখেননি।

অন্যদিকে 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থটিকে অন্যান্য শিশুপাঠ্য থেকে একটু আলাদা করেছে। প্রথমত, এই গ্রন্থে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো দেওয়া হয়েছে, যা বাংলা গদ্য শিখতে গেলে অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, এগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা শিশুমনে একটি সুর বা রিদমের সৃষ্টি করতে সক্ষম। শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে একটি ক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে, এই গ্রন্থেই সেটা তিনি প্রথম দেখিয়েছেন।
যেমন- ক+য=ক্য; ঐক্য, বাক্য।

খ+য=খ্য; মুখ্য, উপাখ্যান।[২২] ইত্যাদি।

এখানে শব্দ বিন্যাসে ছোট-বড় ক্রম লক্ষ্য করার মতো।

তৃতীয়ত, শিশুমনের উপযুক্ত শব্দ সৃষ্টি করে সেগুলি সরল যৌগিক এবং সাধারণ মিশ্র বাক্যের প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে। অধিকন্তু এই গ্রন্থের পাঠগুলি প্রায় সবই পড়া, বিদ্যালয় এবং শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত। যেমন –

> "বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালোবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলোস্য করে কেহ তাহাকে ভালবাসে না।"[২৩] ইত্যাদি। (প্রথম পাঠ)

চতুর্থত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, সেটি হচ্ছে এই গ্রন্থের ভাষার মধ্যে সাধু গদ্যরীতির আড়ালে লুকানো চলতি রীতির ছাঁদ। কথিত ভাষার দিকেই এই গ্রন্থের ভাষার ঝোঁক বেশি।

শিশুমনের উপযোগী বর্ণ শিক্ষা, বানান ও শব্দ শিক্ষা, একাধিক শব্দ দ্বারা সরল বাক্য তৈরি, সরল বাক্য থেকে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য এবং বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ রচনা করে বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ণপরিচয়ের এই অনুচ্ছেদ গুলির মধ্যে গল্পের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে বর্ণপরিচয় গল্পগুলির যেগুলো বিষয়ে ও রূপে মৌলিক, সেগুলো অনেকটা উপেক্ষিতই হয়েছে আজ অব্দি।[২৪]

বর্ণপরিচয়ের গোপাল-রাখাল-নবীন-যাদব-মাধব-সুরেন্দ্র-ভুবন সকলেই বালক। নবম পাঠে আছে, "গোপালের পড়িবার বই নাই।"[২৫] মনে রাখতে হবে এই বাক্যটি শুধু একটি সংবাদ নয়। এখানে এই বার্তা আছে যে, গোপাল খুব দরিদ্র। গোপালের চরিত্রে সমকালীন বাল্যকালের প্রতিভাস ঘটায় গোপাল লেখক এবং পাঠকের খুবই পরিচিত হয়ে ওঠে। সে পিতা-মাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। এই গোপালের বিপরীতেই রাখাল। মজার কথা যে, একজন না থাকলে অন্যজনও অর্থহীন। রাখাল নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না, খেলাতেই তার আগ্রহ বেশি। বইয়ের প্রতি তার অযত্ন, পিতা ও মাতার তিরস্কার ও তাকে পরিবর্তন করতে পারেনা। গোপাল এবং রাখালের গল্প যেহেতু শিশুদের মনোজগৎ তৈরি করার অভিপ্রায়ে লেখা, তাই ভালোভাবে বিকাশের সুযোগ থাকলেও গল্পদুটো অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে বসে বালক মনের সুনীতি ও চরিত্রাদর্শ সঞ্চার করার কথা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের মাথায় থেকে থাকবে। তাই তিনি পরস্পর বিপরীত চরিত্রের সৃষ্টি করে কোন স্বভাবের বালককে সবাই ভালবাসে সেটা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। আর সেটা দেখাতে বেছে নিয়েছিলেন সুঠাম ও শক্তিশালী গদ্যভাষাকে।

'বর্ণপরিচয়' ও 'শিশুশিক্ষা' পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে বেশ কয়েকটি পার্থক্য আমাদের নজরে পড়ে -

১. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যোজনার ক্ষেত্রে মদনমোহন যেখানে সংস্কৃত মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি সেখানে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ে বাংলাভাষায় অব্যবহৃত অক্ষর সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিলেন।

২. বাক্য গঠন শেখাতে, শিশুদের ক্ষেত্রে মদনমোহন যেমন ধ্বন্যাত্মক শব্দের দিকে জোর দিয়েছেন, বিদ্যাসাগর কিন্তু জোর দিয়েছেন টেলিগ্রাফিক বাক্যের মতো ছোট ছোট বাক্য গঠনে। মদন মোহনের বাক্যগঠনের পদ্ধতিতে কাব্যের প্রভাব এ ক্ষেত্রে চোখ এড়ায় না।

৩. বর্ণপরিচয়ে শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেমন একটি ক্রমের অনুসরণ করেছেন, মদনমোহনের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায়না। বিদ্যাসাগর প্রথমে দুই অক্ষরের, তারপর তিন অক্ষরের শব্দ গঠন করেছেন। 'শিশুশিক্ষা'য় এটি অনুপস্থিত।

৪. প্রথমদিকে শিশুপাঠ্য প্রাইমার গুলিতে বালকের আধিক্য দেখা গেলেও মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' এক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম। যেহেতু বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষা পাঠ্য ছিল, ফলে তাঁর গ্রন্থে আমরা বামা ও রামার কথা পাই। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'তে বালিকা চরিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৫. যদি দুটি গ্রন্থের মিলের কথা বলা যায়, তবে বলতে হবে যে দুটি গ্রন্থেই নীতি শিক্ষার ওপর প্রচুর পরিমাণে জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ঔপনিবেশিক সময়ে বঙ্গদেশের শিশুমন গড়ার ক্ষেত্রে বিদেশি কিন্ডারগার্ডেন জাতীয় শিশু পাঠ্যগ্রন্থের প্রভাব থেকে থাকবে। ফলে এই নীতিশিক্ষার জগত থেকে কোনো প্রাইমার রচয়িতা বেরিয়ে আসতে পারেননি।

৬. 'বর্ণপরিচয়' ও 'শিশুশিক্ষা'র মধ্যে পার্থক্য নজরে পড়ে সেটি মূলত ভাবগত। 'শিশুশিক্ষা'র লেখক অন্ত্যমিল, ছন্দমিল প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেন, অন্যদিকে 'বর্ণপরিচয়' এর লেখক গুরুত্ব দেন গদ্যভাষা শেখানোর ওপর। ফলে মদনমোহনের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে 'পাখি সব করে রব' এর মত অসাধারণ প্রভাতী গান, আর বিদ্যাসাগর আমাদের সামনে তুলে ধরেন গোপাল রাখালের অনুপম গল্প।

অতএব এ কথা বলা যেতে পারে যে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিশুশিক্ষা রচনার মাধ্যমে মদনমোহন বাঙালি শিশুকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেবার যে সূত্রপাত করেছিলেন, সেটাই সম্ভবত সম্পূর্ণ হলো এসে বিদ্যাসাগরের হাতে। বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়ে'র মাধ্যমে বাঙালি শিশুকে হাত ধরে আধুনিকতার পাঠ দিলেন। আশীষ খাস্তগীর মশাই সম্ভবত সঠিকভাবেই বলেছেন যে,

> "বিদ্যাসাগর বাঙালিকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন অনেকদূর। মদনমোহনের কাব্যসুরভি বর্জন করে নির্মেদ, যুক্তিশীল ও সুঠাম গদ্যের ভঙ্গিতে দেখা দিল বর্ণপরিচয়।"[২৬]

Reference :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা, মৌসুমী, 'বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য', প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, সম্পাদক, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, ২য় সং, মার্চ, ২০০৬, রত্নাবলী, পৃ. ১৫৮৭

২. পাল, নিমাইচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রন্থাবলী, প্রসঙ্গকথা, ১ম সদেশ সং, বইমেলা, ১৪১২, সদেশ কলকাতা, পৃ. চ

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৭, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ১২৬

৪. খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদিত), বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, অধ্যায় ১৮, পৃ. অনুল্লেখিত

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ, সাধারণ সং জৈষ্ঠ্য ১৩৮৭, পুর্ণমুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ১১

৬. তর্কালঙ্কার, মদনমোহন, শিশুশিক্ষা ১ম, ৫ম পাঠ, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৭. তদেব, পৃ. ১৯৯

৮. তদেব, পৃ. ২০৪

৯. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, অখণ্ড সং, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়- প্রথম ভাগ, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, পৃ. ১০১৭

১০. তদেব, পৃ. ১০১৭

১১. রায়, বিনয়ভূষণ 'বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা', রেখা রায়চৌধুরীর রবীন্দ্রচেতনায় শৈশব গ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪, দীপায়ন, কলকাতা, পৃ. ২২০

১২. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১৮

১৩. তদেব, পৃ. ১০১৯, ১০২০

১৪. পাল, নিমাইচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রন্থাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৫. তদেব, পৃ. ২৬

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সহজপাঠ প্রথম ভাগ, পঞ্চম পাঠ, আষাঢ় ১৪১১ সং, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৩৩

১৭. ভট্টাচার্য, শাশ্বত, মধ্যশ্রেণী ভদ্দরলোক ও বাংলা শিশুপাঠ্যের কাহিনি, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭৭, ১৫৭৮

১৮. পাল, নিমাইচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রন্থাবলী, শিশুশিক্ষা-১ম, পূর্বোক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত।

১৯. তদেব, শিশুশিক্ষা-২য়, পৃ. ৪৯

২০. খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদিত), বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, শিশুশিক্ষা-৩য়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

২১. তদেব, পৃ. ২৩০

২২. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২২

২৩. তদেব, পৃ. ১০২২

২৪. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, 'মৌলিক বিদ্যাসাগর', নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৫, বামা পুস্তকালয়, পৃ. ২৭

২৫. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, বর্ণপরিচয় ১ম পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১৮

২৬. খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদিত), বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, 'উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমার', পৃ. ১৫

Bibliography :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৭, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা।

আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫), প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

নিমাইচন্দ্র পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রন্থাবলী, ১ম সদেশ সং, বইমেলা, ১৪১২, সদেশ কলকাতা,

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'মৌলিক বিদ্যাসাগর', নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৫, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, সাধারণ সং জৈষ্ঠ্য ১৩৮৭, পুর্ণমুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজপাঠ প্রথম ভাগ, পঞ্চম পাঠ, আষাঢ় ১৪১১ সং, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রেখা রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রচেতনায় শৈশব, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪, দীপায়ন, কলকাতা।

সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ২য় সং, মার্চ, ২০০৬, রত্নাবলী, কলকাতা।

সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, অখণ্ড সং, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা।